PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine due to prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

একাদশ অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪২৭/ 24.02.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
জন্মদিনে বাণী	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
আনন্দ-ভগবান	শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীপ্রীতিকুমারের অধ্যাত্ম সাধনা	শ্রী প্রণব ঘোষ
রামদাসজীর অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
মাতৃ-প্রণাম	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
হৃদয় মাঝে অস্ত্র ধরি	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
পুনর্মিলন	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

জন্মদিনে বাণী

শ্রীপ্রীতিকুমার

(২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ সাল)

আজকের এই শুভ দিনে আমার জীবনে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম ও ধর্মজীবনের পূর্ণতা সাধনে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহায়তাও কামনা করি।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং তাঁর লীলায় সহায়তা করবার জন্য আমরা আগেও যেমন মিলিত হয়েছিলাম, এজন্মেও পুনরায় সম্মিলিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন – কলমির দলের এক জায়গায় টান দিলে চারদিক হ'তে তার লতাপাতার দল জড়ো হয়।

পূর্বে আমাদের সংযোগ ছিল, তাই এজন্মেও আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। বিগত জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর যেটুকু কর্ম অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্মে সেই দিব্য কর্মে পূর্ণতা আনবার জন্যই আবার আমরা মিলিত হয়েছি। এই জন্মেই আমাদের সেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

সকলেই যে ব্যক্তিগত ভাবে সাধন-ভজন করতে পারছেন বা পারবেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা, আলাপন, আদান-প্রদান – এগুলির মাধ্যমে যে শাশ্বত স্পন্দন ও স্ফূরণ ঘটছে, তাতেই আমরা সেই পরমের নিকটবর্তী হচ্ছি অতি সহজে।

আমাদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-ব্যথার যতই সঙ্ঘাত আসুক না কেন, তা আমাদের মনকে সাময়িক ভাবে স্পর্শ করলেও আত্মা প্রাণ ও হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে না। এঁরা পূর্ণভাবেই সর্বদা যুক্ত আছেন তাঁর সাথে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত – যে ভাবেই হোক, তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলেছেন।

আমরা তাঁরই, তিনি আমাদেরই।

জয়তু পার্থসারথি!

ব্রাব্র

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

শ্রীপ্রীতিকুমার সকলের "দাদা" হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁর কাছে সবাই আসতেন একটু আশ্রয়ের জন্য, একটু সমবেদনার জন্য, একটু আশীর্বাদের জন্য। তাঁরা শ্রীপ্রীতিকুমারকে সাধক হিসাবেই জানতেন। তাঁর যে একটি ব্যক্তিগত দিক ছিল, অল্প বয়সে প্রেম-চেতনা প্রকাশমান ছিল তা আমিও ভুলতে বসেছিলাম। আমি বিয়ের পর থেকেই জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ছুটি আর পাইনি। এখন সেই পুরনো দিনের চিঠিগুলি উল্টেপাল্টে আমারও কান্না পেয়ে যায়। মনে হয় তখন কেন এই ভাষা বোঝবার চেষ্টা করিনি। তখন চিঠি পড়তাম, লুকিয়ে রেখে দিতাম। কাউকে দেখাতে পারতাম না, কারণ আমার ঠিক "প্রেমপত্র" বা স্বামীর চিঠি পড়াবার মত বন্ধু ছিল না, আর শ্রীপ্রীতিকুমার অসম্ভব বানান ভুল করতেন। যে বানানটি তিনি "গীতা" বা "পার্থসারথির" ক্ষেত্রে ঠিক লিখতেন, চিঠির মধ্যে ঠিক উল্টো লিখতেন। আমি এই বানান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে চেঁচামেচি করেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছেন, "আমি ঐ বানানই লিখব, কলমে যা এসে যাবে তাই লিখব।" আমার চেঁচানই সার হয়েছে। তাই মেনে নিয়েছি। না হলে ত' চিঠি পাবনা। বিদেশে চিঠি পাবার যে কি আনন্দ তাও ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। মনের মধ্যে একাকিত্ব বোধ থাকেনা।

শ্রীপ্রীতিকুমার যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, কিভাবে সান্ত্বনা দিতেন তার প্রকাশ পাবে এবারের চিঠিগুলিতে। শেষের দিনগুলিতে বড় বুড়িয়ে গেছিলেন – তাই যাঁরা তাঁকে অল্পবয়সে দেখেন নি এ চিঠিগুলি তাঁদের উৎসাহিত করবে, ভালো লাগবে।

Lepo Road,
Hazaribag
22. 1.60

প্রিয় সাথী,

তোমার পরশ পেয়েছি। সব মধুময় হয়ে গিয়েছে। সুন্দর লিখনী পেয়ে চিত্তে ঝড় উঠেছে। "প্রিয়া, প্রিয়া" ডাক ছাড়ছে। মানুষ সব দুঃখ ও ব্যথা

DO NOT COPY

ভুলতে পারে যদি সে প্রিয়জনের নিকট থেকে পায় প্রেম ভালবাসা ও সহযোগিতা। তুমি যে আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ তা কিন্তু সব কিছুতেই ধরা পড়ছে। তুমি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা। সত্যি কথা বলতে কি, বলতে লজ্জা করে পাছে কেউ জেনে যায় বা শুনে ফেলে।

ভালবাসি সত্যি আমি। আর ভাল না বেসে থাকতে পারি কই? ওখানেই আমার সব আনন্দ, ওখানেই আমার ঈশ্বর। ওর ভিতরেই খুঁজে পাই সব। তাই ভালবাসাকে ঘিরেই সব কিছু। এ বিশ্বে যা কিছু চাই, তা আমার প্রেম দিয়ে অধিকার করি। তাও তোমার প্রেমের সঙ্গে জড়িত হয়ে। যত ব্যথা পাই তত পাই তাঁকে, এ'তো দেখেছি। তাই আরও ছুটে যাই সেই ভালবাসার কাছে। বাইরের কিছু নেই যা দিয়ে তাকে ধরা দিতে পারি। তাই নীরবে হৃদয়কে খুলে রাখি তার কাছে। ধরা দেয়, তাই ধরে আছি।

গতকাল বিকেল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত তোমাকে ঘিরে শুধু চিন্তা করেছি সকল সময়। কখন কি করছ, এ জয়ে কি আনন্দ পাচ্ছ এই অনুভূতি আমাকে ঘিরে ছিল। সমস্ত খবর দেবে।

বাবুর খবর দেবে। ঘোড়ায় চড়ছে তো? কি করে সারাদিন? ওকে বকাবকি করবে না। টাকার দরকার হলে ঐ টাকা থেকে খরচ করবে। আবার ভরে দেব। Within a week আমাকে হয়তো Orissa যেতে হতে পারে। পরে সব জানাব।

বাবুকে আমার স্নেহ চুম্বন দিও আর আদর জেনো তুমি।

ইতি -
প্রীতিকুমার

১৩/২/৬২

Dear Shukla,

ভোটের কাগজটি পাঠালুম। তোমার নং ১৩২, পার্ট নং ২, এ বাসা থেকে। সকাল ৮টার ভিতর রবিবাবু, গঙ্গা ও মন্টু ওরা সকলে ভোট দিতে যাবে। এদের বলে রাখলুম। তুমি সকাল ৮টার ভিতর এলে এদের সঙ্গে যেতে পারবে।

প্রীতিকুমার

হাজারীবাগ
5.3.60

প্রিয় সাথী,

নানান অশান্তি আর শত্রুতার ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এক মুহূর্ত আর থাকবার ইচ্ছে নেই। যে কোনও সময় হয়তো চলে যাব। TP কলকাতায় আছেন। ২/৩ দিনের ভিতর আসবেন মনে হয়। এলে কলকাতায় ফিরব। এ ধরণের দাসত্ব আর মেনে নিতে পারছি না। Mr Banerjee ব্যক্তিগত ভাবে খুবই শ্রদ্ধা করেন। তবুও তার পার্ষদদের সঙ্গে মোটেও মনের মিল আনতে পারছি না।

যাক, চিঠি নেহাৎ দরকার না হলে আর দিও না। আমি নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাব। পূর্ণভাবে ঁমায়ের নিকট বিশ্বাস রাখ, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কোনও চিন্তা করোনা। আগামী কাল হয়তো ধানবাদ যাব। সেখান থেকে ২/৪ দিনের ভিতর হাজারিবাগ ফিরব।

বাবুকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। তুমি আমার আদর জেনো।

ইতি -
প্রীতিকুমার

Asansol
10th March,'60

প্রিয় সাথী,

সারাদিন ঘুরে ফিরে তোমার কথাই মনে হচ্ছে। নিজের ভিতরটা বড় ফাঁকা হয়ে গেছে। আজ এই দিনে যদি তোমার কাছে থাকতাম! তুমি কত ভাবে যত্ন ও সেবায় সাজিয়ে আমার চিত্ত ভরে রাখতে তার হিসাব তো ভাষায় দেওয়া যায়না। দূর থেকে তোমার শান্ত কোমল মুখ আমার চোখের সামনে

DO NOT COPY

ভাসছে। তোমার আদর, শাসন ও আব্দার আমার প্রাণে ঢেউ তুলেছে। আমি প্রত্যক্ষ করছি আমার অঙ্গে অঙ্গে নদী যেমন সমুদ্রে মিশে তার সত্বা হারিয়ে ফেলে, আমি তেমন তোমার প্রেমে নিজেকে হারিয়ে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে আছি। আজ এই যে হৃদয়ে শাশ্বত স্পন্দন ও মধুর গীত সত্যের অনুভুতি জাগিয়ে দিয়েছে তাই এই বিশেষ দিনে তোমায় মনের কথা বলি – তুমি আমাকে ভুলে থেকো না। সকল অবস্থায় তুমি আমাতে থাকো।

বাবুকে দিও আমার আশীর্বাদ। তুমি নাও আমার হৃদয়ভরা আদর।

ইতি
তোমার প্রীতিকুমার

Hazaribag
14.3.60

প্রিয় সাথী,

রাঁচী আসানসোল থেকে যে সব চিঠি দিয়েছি সবই পেয়েছ নিশ্চয়ই। আমি এর ভিতর কলকাতায় যেতে পারছিনা। 18th March Orissa রওনা হচ্ছি। ওখান থেকে ফিরেই কলকাতায় যাব। তোমার হয়তো খুবই কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্মীটি আর কটি দিন কষ্ট করে থাক। শীঘ্রই ফিরে আসব। বাবুকে নিয়ে সাবধানে থেকো। এই সময় রোজ তিতা খাওয়া খুব ভাল। রোজ খেতে পারলে আরও ভালো হয়। মন্টুর চিঠি পেলাম। ওর চাকরী হয়েছে জানলাম। এর ভিতর হয়তো তোমার আর কোন চিঠি পাবো না। কারণ চিঠি আসতে আসতে আমি তো চলে যাব। ২/১ দিনের ভিতর সংসার খরচ পাঠাব। কষ্ট করে চালিয়ে নিও। আগামী কাল ৫০ টাকা M.O. করে পাঠাব। যদি আরও দরকার হয় রবি বা নীলুর কাছ থেকে নিয়ে নিও। আমি রবিকে চিঠি দিচ্ছি। ওর কাছ থেকে নিও। এখান থেকে বেশি M.O. করা অসুবিধা। টাকা পেলে আমাকে প্রাপ্তি সংবাদ দেবে এবং অন্যসব খবরাখবর দেবে। অনেকদিন কোন সংবাদ পাইনি। হাজারিবাগের ঠিকানায় চিঠি দিও। বাবু মহাশয় কেমন আছেন? কি বলেন? অন্য নূতন খবর কি?

বাবুকে স্নেহ-চুম্বন দিও। তুমি আমার আদর জেনো।

ইতি -
প্রীতিকুমার

⊠⊠

আনন্দ-ভগবান **শ্রীঅরবিন্দ**

প্রারম্ভে আমাদের মন অথবা প্রাণ যে অভিপ্রায়ের প্রেরণাতেই যোগ সাধনা আরম্ভ করুক না কেন, সত্তার মধ্যে ভগবানকে চাওয়া যদি প্রকৃতই থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত ভগবৎ উপলব্ধি হবেই। অন্তরস্থ আত্মার মধ্যে সর্বদাই ভগবানকে চাওয়ার ব্যাকুলতা আছে। কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায়কে আত্মা ব্যবহার করে যার সাহায্যে মন ও প্রাণকে অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ করান যায়। ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী ভালবাসা আছে তা যদি মন ও প্রাণ গ্রহণ করে এবং অনুভব করে তাহলে যোগ সাধনা পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং অনেক বাধা বিঘ্ন দূরে যায়। মন-প্রাণ যদি আত্মার নির্দেশ না মানে তাহলেও তারা যা চায় তা ভগবানের কাছ থেকে পায়, এবং কিছু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও তাদের হয় যার প্রভাবে তাদের প্রাথমিক বাসনা কামনাকেও তারা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ভগবানকে নিরানন্দময় বলা মূঢ়তারই পরিচয়। ভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা মনের অজ্ঞানতাই করতে পারে। রাধা-প্রেম ঐরকম ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রাধাপ্রেমের সরল অর্থ এই যে ভগবানের মিলনের পথে যাহাই আসুক না কেন- বেদনা অথবা আনন্দ, মিলন অথবা বিরহ- আর বেদনা যত দীর্ঘ সময়ই স্থায়ী হোক না কেন, এই প্রেম অটল এবং তার বিশ্বাস এবং নির্ভরতা অক্ষুন্ন থাকে এবং ধ্রুব তারার মতনই পরমতম প্রেমাষ্পদের অভিমুখে পথ নির্দেশ দেয়।

DO NOT COPY

দিব্যানন্দের প্রকৃত স্বরূপ কী? মনের কাছে উহা একটি মনোরম মানসিক অবস্থার বেশী আর কিছু নয়। দিব্যানন্দ যদি তাই হত তা হলে ভক্ত আর ভাব যোগীরা ইহার মধ্যে রসোন্মাদের সন্ধান পেতেন না। আনন্দ যখন আমাদের কাছে আসে, তখন ভগবানই আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। আর যখন আমরা আলোকের দ্বারা প্লাবিত হই তখন ভগবান নিজেই আমাদিগকে চারিদিক থেকে প্লাবিত করেন। অবশ্য ভগবান ঐসবের থেকেও অনেক বেশী; তিনি আরও অনেক কিছু, এবং ঐ সবের মধ্যেই আছে তাঁর উপস্থিতি, তাঁর সত্তা, তাঁর দিব্য ব্যক্তিত্ব। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবানই শিব, তিনিই পরম জননী। আনন্দের মাধ্যমেই আনন্দময় কৃষ্ণের উপলব্ধি হয়, কারণ আনন্দই কৃষ্ণের সূক্ষ্ম দেহ এবং সত্তা। শান্তির মাধ্যমে শান্তিময় শিবের সাক্ষাৎকার হয়। আলো মুক্তিদায়ী শক্তি, প্রেম এবং সিদ্ধিদাতা। ঊর্ধ্বে উত্তোলনকারী শক্তির মধ্যে দিব্য জননীর উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। ঐ সব উপলব্ধিই ভক্ত এবং ভাবযোগীদের অভিজ্ঞতাকে হর্ষাকুল করে এবং তীব্র মনোবেদনা ও বিরহের রাত্রি সহজেই সহ্য করতে সক্ষম করে। আত্মার এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি সামান্য মাত্র সংক্ষিপ্ত আনন্দকেও এক অনন্য শক্তি বা প্রাধান্য দেয় যার সাহায্যে আনন্দ বর্ধিত ও স্থায়ী হয় এবং প্রত্যাগমন করে।

দিব্য করুণা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবার জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অজ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যখন আলোকের অনুগামী হই তখনই দিব্য করুণার অনুভূতি আমাদের হয়। উহা ক্ষণিকের জন্য অলৌকিক কাজ করে সরে যায় না। দিব্য করুণা আমাদিকে আলোকের পথে যেতে সাহায্য করে এবং পরিশেষে অজ্ঞানতা থেকে ইদ্ধার করে।

ভগবান অনেক সময় আমাদিকে অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে যান, কারণ, অন্ধকার রয়েছে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের চারিপাশে। কিন্তু তিনি আমাদিকে আলোকের দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন, আর কোন কিছুর দিকে নয়।

শ্রীপ্রীতিকুমারের অধ্যাত্ম সাধনা

প্রণব ঘোষ

আমার দাদা প্রীতিকুমার গুপ্তযোগী ছিলেন; নিজেকে সচরাচর প্রকাশ করতেন না। তাই তাঁর সাধনা বা উপলব্ধির কথা অল্পই জানা যায়। সাধনার শেষে যখন তিনি বেশ কিছুকাল লোকাচার্যের মতো ছিলেন তখন কিছু লোক তাঁর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতির পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সাধক জীবন চিরকাল রহস্যাবৃত থেকে গেছে। আমি দাদার জীবনের একটি পর্বে তাঁর কাছে ছিলাম। কখন কখনও তাঁর মুখ থেকে দু'এক কথা শুনেছি, কখনও বা তাঁকে সাধনারত অবস্থায় দেখেছি। যা দেখেছি যা শুনেছি তাই এখানে প্রকাশ করছি।

দাদার সাধন ভজনের সূত্রপাত কৈশোরে। তখনও তিনি স্কুলের ছাত্র। এখানে বলে রাখা দরকার, দাদার বয়স যখন ১১/১২ বছর তখন বাবার মৃত্যু হয়। মৃত্যু হলেও তিনি প্রয়োজনে দাদাকে দেখা দিতেন এবং পরিচালিত করতেন। সাধনপথের নির্দেশও তিনি দিতেন।

একবার স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। দাদা তখন স্কুলের ছাত্র। বাবা দাদাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন-তুমি স্বামিজীর কাছে যাবে; উনি তোমাকে দেখবেন। দাদা কাছে যেতেই প্রণবানন্দজী দাদাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আশীর্বাদ করেন। মা একবার আমাদের নিয়ে বেশ কিছুদিন মামাবাড়ি ছিলেন। দাদা তখন একাই বাড়িতে থাকতেন। মনে হয় তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় সক্রিয় কর্মীরা সব আত্মগোপন করে আছেন। বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী আমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদা একা থাকেন দেখে তাঁদের মধ্যে তিন চার জন আমাদের বাড়িতে থাকতেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম আমার জানা- একজনের নাম সন্তোষ কুমার ঘোষ। তিনি সম্ভবত খুলনা জিলা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। দেশ ভাগের পর দমদম ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে বাস করতেন। অপরজন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির বিখ্যাত তাত্ত্বিক নেতা এবং পরবর্তী কালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় নিহত সরোজ দত্ত। বাবা দাদাকে

দেখা দিয়ে হরিনাম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট নেতারা রাত্রে যখন ঘুমাতেন, দাদা রাত জেগে হরিনাম করতেন। একদিন তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে সন্তোষদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি রে, তুই সাধু হবি নাকি?" শেষ পর্যন্ত সন্তোষদার কথাই খেটে গেল। দাদা সাধুই হলেন। সাধু শ্রীপ্রীতিকুমারকে দেখতে পরে সন্তোষদা বার কয়েক অক্ষয় বোস লেনের বাসায় এসেছিলেন। আমি তখন ঐ বাসায় দাদার সঙ্গেই থাকতাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে দাদা বোম্বাই যান এবং একজন আত্মীয়ের বাসায় থাকেন। সেখানেই তাঁর ধ্যান যোগ সূচনা। বলাবাহুল্য এই পথে বাবাই তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। এই সময় দাদা একটি অচিন্তনীয় দর্শন লাভ করেন। একদিন বাবা দেখা দিয়ে কিছু চাল ও কলা নিয়ে শহরের একপ্রান্তে একটি বিশেষ স্থানে উপস্থিত হতে বলেন। সেই নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতেই দাদা দেখেন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট সশরীরে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দাদা চাল কলা তাঁকে দিলেন এবং তিনি হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই অলৌকিক ঘটনায় দাদা খুবই অভিভূত হন। এর কি অর্থ বা তাৎপর্য তা জানবার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ হয়। তখন তিনি পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নলিনীকান্ত গুপ্তের কাছে চিঠি লেখেন। উত্তরে নলিনীকান্ত নাকি দাদাকে লেখেন-তোমার উপর ভূতে ভর করেছে। ঐ চিঠি পেয়ে দাদা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ঐদিনই যীশুখ্রীষ্ট পুনরায় দাদাকে দর্শন দেন এবং দাদা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন ঐ যীশুমূর্তি ধীরে ধীরে বাবার মূর্তিতে পরিণত হয়।

ছবিতে যীশুখ্রীষ্টকে যেমন দেখা যায় সেই চেহারার সঙ্গে দাদার অপেক্ষাকৃত কম বয়সের চেহারার অপূর্ব মিল ছিল। একবার মধুপুরে গেলে এক ভদ্রলোক সেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের একখানা সুন্দর প্রতিকৃতি উপহার দেন। সে প্রতিকৃতিখানা সম্ভবত এখনও শ্যামবাজার অক্ষয় বোস লেনের বাসায় আছে।

বোম্বাইয়ে দাদা কতদিন ছিলেন মনে নেই, হয়ত বছর দেড়েক হবে। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে দাদা নিয়মিত ধ্যান যোগ অভ্যাস করতেন। এই সময় একদিন বাবা দেখা দিয়ে যোগ সাধনার নিয়ম প্রণালী শিক্ষার জন্যে শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র কুমার ঘোষের কাছে যেতে বলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে দাদা শ্রদ্ধেয় বারীন ঘোষের কাছে যেতেই তিনি দাদা যেন তাঁর কত পরিচিত এইভাবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং পরপর তিনদিন যোগ শিক্ষা দেন।

এর কিছুকাল পরে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন দাদা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভবানীপুরের একটি রেস্তোঁরায় বসে চা খাচ্ছিলেন। এই সময় একজন অপরিচিত লোক এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান এবং বিন্ধ্যাচলে যাবার নির্দেশ দেন। অন্য আর একজন এসে কোথায় কিভাবে যেতে হবে সবকিছু জানিয়ে একখানা টিকিটও দিয়ে যান। এক্ষেত্রে বাবা কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেন নি। তথাপি দাদা অলৌকিক ভাবে প্রাপ্ত ঐ নির্দেশ মেনে বিন্ধ্যাচলে যেতে দ্বিধা করেন নি। বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হতেই জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে মাইলখানেক ভিতরে নিয়ে যান। একমাস একটানা সাধন শিক্ষা লাভের পর দাদা পুনরায় নির্দেশ পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিন্ধ্যাচল শুধু বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর জন্যেই বিখ্যাত নয়। এই অঞ্চল তন্ত্রসাধনা এবং প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের সাধন ক্ষেত্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ।

বিন্ধ্যাচলে যাবার অব্যবহিত আগে বা পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। তার সঙ্গে দাদার সাধনার কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানিনা, তবে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। দাদা তখন শিকদার বাগান স্ট্রীটে অমৃতবাজার পত্রিকার Sunday Magazine-এর সম্পাদক রমেশচন্দ্র রায়ের বাসায় থাকেন। রমেশবাবু গঙ্গায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করবেন, সেই সঙ্গে দাদাও নিজের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করবেন বলে স্থির হয়। তখন বাবা দেখা দিয়ে বলেন, পিন্ডদান একবার হয়েছে, দ্বিতীয়বারের প্রয়োজন নেই, বরং একটা কাজ কর, গঙ্গার ঘাটে বটগাছের নীচে তেরজন লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একখানা গামছা, চার আনা পয়সা ও কিছু বিড়ি কিনে

DO NOT COPY

নিয়ে যেও। দাদা জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে তাঁদের চিনবো? বাবা বলেন, তোমার চিনতে হবেনা, তাঁরাই তোমাকে চিনে নেবেন। দাদা এই নির্দেশের কথা রমেশবাবুর কাছে প্রকাশ করে ফেলেন। রমেশবাবু কতটুকু বিশ্বাস করেছিলেন জানিনা, তবে গঙ্গার ঘাটে তিনি দাদার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছালে দেখা গেল তের জন সৌম্যকান্তি পুরুষ বটগাছের নীচে অপেক্ষা করছেন। দাদা কাছে যেতেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। দাদা তাঁদের গামছা ও পয়সা দিলে একজন জিজ্ঞাসা করলেন "বিড়ি আনতে কি ভুলে গেছেন?" দাদা বিড়ি এনেছিলেন, কিন্তু অলৌকিক ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে বিড়ি বার করতে ভুলে যান। থলে থেকে বিড়ি বার করে দিলে তাঁরা সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা গামছারও প্রশংসা করেন, তারপর বলেন "আমরা তৃপ্ত"। তখন দাদা ও রমেশবাবু তাঁদের প্রণাম করবার জন্য নত হতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান।

এর পরের ঘটনাও কম বিস্ময়কর নয়। শিকদার বাগানে রমেশবাবুর বাসায় থাকতে থাকতেই একদিন এক ভদ্রলোক এসে দাদাকে বলেন তাঁকে কিছুদিনের জন্যে পুরী যেতে হবে। বলা বাহুল্য সাধন ভজনের প্রয়োজনেই এই নির্দেশ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও সিকদার বাগান স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারীর বাড়ির সামনে একজন লোক এসে পুরীর একখানা টিকিটও দিয়ে যান। পুরী ষ্টেশনে নামতেই একজন ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে এসে দাদাকে অভ্যর্থনা করে বলেন, "আমি স্বপ্নে পেয়েছি আপনি পুরীতে আসছেন, আমি যেন আপনার সেবা করি।" থাকার ব্যবস্থা হয় ধর্মশালায়। ধর্মশালায় সাধারণত তিনদিন থাকতে দেওয়া হয়। দাদার ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। যতদিন প্রয়োজন ছিল দাদা ঐ ধর্মশালায় ছিলেন এবং ঐ ভদ্রমহিলা তাঁর সেবা করেছিলেন। পুরীতে দাদা যে কয়দিন ছিলেন একটি কুকুরও সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। পুরী ছেড়ে আসার সময় কুকুরটিও ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। আমি শুনেছি, কখনও কখনও মহাত্মারা কুকুরের ছদ্মবেশে এসে পাহারা দিয়ে থাকেন। দাদার ক্ষেত্রেও তেমন কিছু একটা হতে পারে।

কলকাতায় ফিরে এসে দাদা নির্দেশ পেয়েছিলেন রাতের দিকে দক্ষিণেশ্বর যেতে। একদিন গভীর রাতে ঠাকুরের ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাদা অনুভব করেছিলেন যেন ঠাকুর আরও জনা কয়েকের সঙ্গে তাঁর ঘরে রয়েছেন এবং কথাবার্তা বলছেন। পঞ্চবটী ও বেলতলায় যাবার জন্যেও নির্দেশ পেয়েছিলেন। একদিন বেলতলায় যাবার পথে কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁকে বাধা দেয়।

৫এ অক্ষয় বোস লেনে দাদা সম্ভবত ১৯৪৯ সাল থেকে থাকতে শুরু করেন। এখানেই ঠাকুরের আসন স্থাপন করে দাদা নিয়মিত ধ্যান ও পূজাপাঠ শুরু করেন। আসনে ছিলেন মা কালী, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা। পরে শ্রীঅরবিন্দের পাদপদ্মও স্থাপিত হয়েছিল। আমি তখন দাদার সঙ্গেই থাকতাম। সকালে শয্যা ত্যাগের পর স্নান সেরে দাদা নিয়মিত ধ্যান ও পূজাপাঠ করতেন। তখন সম্ভবত গীতাও পড়তেন, তবে চন্ডীপাঠের কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। দাদার চন্ডীপাঠ শুনে শুনে আমার অনেক জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে আবার হরিনাম চলত। তবে দাদা নিজে সংকীর্তন করতেন না। দুজন লোক ঠিক করা ছিল। তারা রোজ সকালে এসে খোল বাজিয়ে নামকীর্তন করে যেতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে ৫/৬ জন হরিসংকীর্তন করতেন। একবার আমার কোন পরীক্ষার আগের দিনে দাদা এমনি এক হরি সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। অনেকক্ষণ ধরে সংকীর্তন চলে। পড়তে পারছি না বলে মনে খুব ক্ষোভ। ভাবছিলাম আমার পরীক্ষার কথা জেনেও দাদা এই কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন! তখন তো আর বুঝিনি দাদার তখন দিব্য আবেশ চলছে। গভীর রাতে আসনে বসে দাদা ব্যাকুল কন্ঠে 'মা মা' করতেন। দাদার সেই প্রাণ নিঙড়ানো 'মা মা' ডাক আমি যেন এখনও শুনতে পাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ডাকার মতো একবার মাকে ডাকো তো দেখি, মা কেমন না শুনে থাকেন। দাদার সেই ডাকার মতো ডাকে মা যে সাড়া দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রতি দাদার গভীর ভক্তি ছিল। দাদার সধনার ধারা অনেকটা ঠাকুরের ধারার মতোই। ঠাকুর যেমন হিন্দু ধর্মের ভিন্ন

DO NOT COPY

ভিন্ন মত অনুসরণ করে সাধনা করেছিলেন, দাদাও তেমনি যোগ, তন্ত্র, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং শেষে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ'-এই আদর্শ অনুসরণ করে লোক শিক্ষা প্রচার করেন।

শ্রীঅরবিন্দের যোগমার্গে শিক্ষা গ্রহণ করলেও বাবার নির্দেশে দাদা শ্রীঅরবিন্দের গীতা অনুধ্যান ও প্রচার করেন।

সাধক অবস্থায় দাদা যে সকল মহাপুরুষের সঙ্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামঠাকুরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রামঠাকুরের সঙ্গে দাদার সাক্ষাৎ হয় কলকাতার ডিক্সন লেনে। দাদাকে দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। খুব ভালো, খুব ভালো, অনেক হবে-বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। রামঠাকুরের প্রতি দাদার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি একবার গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাদাকে জিজ্ঞাসা করি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর উপমা দিয়ে দাদা বলেছিলেন গুরুর সংস্পর্শে ঐভাবে আলো জ্বলে যায়। দাদা আরও বলেছিলেন, সব সময় মন্ত্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্পর্শে, সান্নিধ্যে, দৃষ্টিতেও দীক্ষা হয়ে যায়। কেন জানি না, তারপর বলেছিলেন, আমি তো রামঠাকুরের মতো মহাপুরুষের সঙ্গ করেছি।

তারাপীঠের সঙ্গেও দাদার সাধনার গূঢ় যোগ ছিল। বেশ কিছুদিন আমি তাঁকে 'তারাপীঠ ভৈরব' বইখানা পড়তে দেখেছি। তিনি বহুবার তারাপীঠ গেছেন এবং সেখানে একটা স্থায়ী আশ্রয় নির্মাণের জন্য জমিও কিনেছিলেন।

নীরব সাধনায় দাদার দিব্য সত্বার কোরকটি কবে যে প্রস্ফুটিত হয়ে গেছে, তা আমরা বুঝিনি। ফুল ফুটলে যেমন চারদিকে তার সৌরভ ছড়ায়, দাদার সাধনার সৌরভও দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শুরু হয়ে যায় ভক্ত সমাগম। অনেক সাধু সন্ত মহাপুরুষও দাদাকে স্বীকৃতি জানান। কাশীর একজন পাঞ্জাবী সাধু দাদাকে দেখে কয়েক হাত ছিটকে যান, তারপর বলেন, "আপনি তো দেখছি জন্ম যোগী। দেখতে পারছেন না, কত মহাত্মা আপনাকে পাহারা দিচ্ছেন?

বালীর একজন তান্ত্রিক সাধুও প্রায় একই কথা বলে দাদাকে প্রণাম করেছিলেন। আর বাহের বাবাও দাদাকে মহাপুরুষ বলে অভিবাদন করেছিলেন।

দাদা মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে তিনি কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন তা পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তিনি সাধনা ও সিদ্ধির যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোন গৃহীর পক্ষেই অসাধ্য।

রামদাসজীর অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

ভারতবর্ষ হচ্ছে মহাসাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের পীঠস্থান। এখানে বহু সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। সাধক রামদাস হচ্ছেন তাঁদের অন্যতম। মহারাষ্ট্রের এই মহাতাপস ছিলেন একাধারে ভক্তি ও যোগমার্গের সাধক। তিনি ছিলেন মারাঠাবীর শিবাজী ভোঁসলের গুরু। শিবাজীর মাধ্যমে রামদাস এদেশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কারণ রামদাস ছিলেন অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দাসানুদাস। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ও অর্চনার কথা তিনি সারা জীবন ধরে প্রচার করে গেছেন। তাঁর জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি প্রভু রামজীকে পরম ব্রহ্মরূপে মেনে নিয়েছেন। আবার তিনি অদ্বৈতবাদের তত্ত্বও নিষ্ঠাভরে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে এদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন আর তার প্রেরণা তিনি দেন মারাঠাবীর শিবাজীকে।

এই মহা তাপসের জীবনে যেমন ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং তপস্যার তুলনা ছিল না তেমনি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ এবং অলৌকিক বিভূতির লীলা।

নীলোপন্থ ছিলেন রামদাসবাবাজীর গৃহী শিষ্য। একবার দলবলসহ রামদাসজী এলেন তাঁর ঘরে। তখন নীলোপন্থ ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নিরুবাঈ ছিলেন। তিনি রামদাসজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরে স্বামীজী

ও তাঁর সঙ্গীদের যথারীতি আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। কারণ স্বামিজী বেশীক্ষণ তাঁর ঘরে থাকবেন না। এখুনি বুঝি গ্রামান্তরে চলে যাবেন। তাই নীলোপন্থের স্ত্রী উঠে পড়ে লেগে গেলেন স্বামিজীর সেবা শুশ্রুষায়।

ওদিকে ঝড় জল হয়ে গেছে। তাই শুকনো কাঠ ভিজে গেল। আগুন দিলে জ্বলছে না। তখন নীলোপন্থের স্ত্রী এক কাজ করলেন। নিজের ঘরের তোরঙ্গ খুলে যত ভাল ভাল জামাকাপড় ছিল সব বের করলেন। তারপর সেগুলি প্রবেশ করালেন উনুনের মধ্যে। ঐ জ্বালানী দিয়ে তিনি তৈরী করলেন গুরু এবং গুরুভাইদের জন্যে আহার্য সামগ্রী।

তারপর গুরুসেবা চললো। ইতিমধ্যে নীলোপন্থ ফিরে এসেছেন বাড়ীতে। আহারের পর গুরুজী বিদায় নিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলেন গুরুজির শ্রীচরণে।

তখন রামদাসজী প্রসন্ন কন্ঠে বলতে লাগলেন, নীলোপন্থ, তুমি ভাগ্যবান, এমন সাধ্বী স্ত্রী তোমার ঘরে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, আমার খাবার তৈরী করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ সমস্ত মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ উনুনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ভালই করেছেন তিনি। এর ফলে সংসারের মায়া কিছুটা কাটলো।

গুরুদেবের কথা শুনে খুশী হলেন নীলোপন্থ। করজোড়ে বলতে লাগলেন, প্রভু, শত শত ভক্ত শিষ্য আপনার সেবার জন্যে প্রাণপাত করছে, সে তুলনায় নিরুবাঈ আর এমন কি করেছে? যাক, যাবার আগে আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন। আপনার আশীর্বাদই হবে আমার পরম পাথেয়।

নীলোপন্থের কথা শুনে হাসলেন রামদাসজী। তিনি ঝুলি থেকে একটা ডাব বের করে বললেন, বৎস, এই নাও আমার আশীর্বাদ। আমি জানি, তোমরা দীর্ঘদিন কোন সন্তান লাভ করো নি। আমার আশীর্বাদে মাতাজী অচিরে সন্তান সম্ভবা হবেন। আর তাঁর যে ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে কালে সে হবে জীবে রামভক্ত।।

গুরুজীর কথা অচিরে ফলে গেল নীলোপন্থের স্ত্রীর জীবনে। কিছুদিনের মধ্যে নিরুবাঈ-এর গর্ভে একটি সন্তান এলো। ঠিক সময়ে সে ভূমিষ্ঠ হোল। পরবর্তীকালে সে হয়ে উঠলো একজন মহা রামভক্ত।

রামদাসজীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন কল্যাণ। তাঁর গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। একবার রামদাসজী স্থির করলেন, নদীর ওপারে গিয়ে অরণ্যের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সাধন ভজন করবেন। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। গুরুজী গেলেন বনে।

তাই দেখে শিষ্য কল্যাণের মনে দুশ্চিন্তার আর অন্ত রইলো না। তিনি ভাবলেন, গুরুজী একাকী বনের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটাবেন। এই সময়ে তিনি কিছু আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করবেন না। সুতরাং তার শরীর থাকবে কিভাবে? আমি তাঁর জন্যে বেশ কিছুদিন প্রত্যহ একবার করে ভোগ্য বস্তু দিতে আসবো।

আগের দিন প্রচুর জল বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই নদীর জল খুব বেড়ে গেছে। তার জলও হয়েছে ভয়ঙ্করী। সেদিকে ক্রুক্ষেপ না করে গুরু-প্রাণ কল্যাণ মাথায় গুরুজীর জন্যে আহার্য্য দ্রব্য বেঁধে ঝাঁপ দিলেন নদীর জলে।

পরে নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে গেলেন অরণ্যের ভেতর। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা পেলেন গুরুজীর।

গুরুজীর সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাঁকে প্রাণভরে খাওয়ালেন।

গুরুজীও তাঁর সেবায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন।

এরপর প্রায় প্রত্যেকদিন শিষ্য কল্যাণ গুরুজীর জন্যে খাবার নিয়ে খরস্রোতা নদী নির্বিঘ্নে পার হতেন এবং গুরুজীকে যথারীতি সেই আহার্য্য দ্রব্য খাইয়ে আবার ফিরে আসতেন নিজের আস্তানায়। এতে করে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয় নি। বরং উপকারই হয়েছে।

DO NOT COPY

রামদাসস্বামী প্রায়ই পান-সুপারী খেতেন। বিশেষ করে যখন তিনি কবিতা লিখতেন। সেদিন রাতে তিনি একটি অভঙ পদ রচনায় ব্যস্ত আছেন, এক সময় তাঁর পানসুপারী খাবার ইচ্ছে হলো।

তিনি সেবায়েতদের দেকে তুলে বললেন, দ্যাখো তো কৌটার ভেতরে পান-সুপারী আছে কিনা। খানিকটা না চিবোতে পারলে ভালো লাগছে না।

সেবকরা গুরুর আদেশ পালন করতে লেগে গেলেন। তাঁরা কৌটা খুঁজে দেখলেন, তাতে সুপারী রয়েছে কিন্তু পান নেই।

তখন গুরুজী হৈ চৈ শুরু করে দিলেন, পান ছাড়া সুপারী কি খাওয়া যায়। গুরুর চীৎকার শুনে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন সেবকরা। তাঁরা গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। অথচ এ অসম্ভব ব্যাপার। এত রাতে পাহাড়ে পান পাওয়া যাবে কোথায়? যদি মেলে তো নীচে সমতল ভূমির ওপর কোন গৃহস্থের বাড়ীতে মিললেও মিলতে পারে। আর এত রাতে গৃহস্থের বাড়ীর দরজা খোলা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। যে যার সব ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো।

সেবকরা যে যার মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। এমন সময় কল্যাণ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গুরুজীকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, প্রভু, আপনি কিছুকাল ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন। আমি নীচের গ্রাম থেকে এখুনি কয়েকটি পান সংগ্রহ করে আনছি। এই বলে কল্যাণ দ্রুত পায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সমতল ভূমির দিকে নামতে লাগলেন।

অন্ধকার পথ দিয়ে চলেছেন। তাই হঠাৎ তাঁর পা পড়লো বিষাক্ত সাপের গায়ে। তার ছোবল খেয়ে আর্তনাদ করে বসলেন কল্যাণ। তাঁর আর্তনাদ শুনে রামদাস ও তাঁর সেবকরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁরা মশাল হাতে চলে এলেন কল্যাণের কাছে। এসে দেখলেন, কল্যাণ অসহায়ভাবে ভূমির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছেন। চোখ মুখে অসহ্য রকম যন্ত্রনার ছাপ। মুখ দিয়ে ফেনাও বেরুচ্ছে।

তাই দেখে রামদাসজী হাঁটু গেড়ে বসলেন মূর্চ্ছিত কল্যাণের সামনে। তাঁর মাথায় ও গায়ে স্নেহের করস্পর্শ করলেন বারবার। তারপর শান্তভাবে বললেন, বৎস কল্যাণ, এবার ওঠো-ওঠো।

অল্পক্ষণ পরে কল্যাণ চোখ মেলে তাকালেন এবং ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলে তিনি আবার ছুটলেন গুরু মহারাজের জন্যে পান সংগ্রহ করতে। গুরুজী তাঁকে বাধা দিলেন। যেতে নিষেধ করে বললেন, বৎস কল্যাণ, তোমাকে আর পান সংগ্রহ করতে হবে না। তুমি ফিরে চলো আশ্রমে। তাই করলেন কল্যাণ। গুরুজীর কাঙ্ক্ষিত আশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন।

পথে আসতে আসতে জনৈক তরুণ শিষ্য বলতে লাগলো, এতো গভীর রাতে কল্যাণের এভাবে একাকী পথ চলা উচিত হয় নি।

তাই শুনে রামদাসজী শান্তস্বরে বলতে লাগলেন, দ্যাখো, যা ঘটেছে রামজীর কৃপাতেই ঘটেছে। আমরা নিমিত্ত মাত্র। রামজী আমায় ইঙ্গিত দিয়ে ছিলেন যে কল্যাণের আয়ু আর নেই।

গুরুজীর জনৈক সেবক তাঁর কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, সে কি! আপনি যখন জানতেন এই ব্যাপার তখন তাকে কেন একাকী অন্ধকার পার্বত্য পথের মধ্যে দিয়ে যেতে দিলেন।

গুরুজী তখন আসল রহস্য উদঘাটন করে বলতে লাগলেন, সাপের ছোবল খেয়ে ওর জীবনান্ত হবার কথা। অথচ ঈশ্বরের কাজের জন্যে ওকে এখনো বেশ কিছু সময় জীবিত থাকতে হবে। তাই তো পান-সুপারীর জন্যে চেঁচামেচি করে ওকে দুর্গম পার্বত্য পথে নামালুম। ওকে সাপে যে দংশন করবে তা আমি আগে থেকে জানতুম। আমার কাছাকাছি থেকে ওর যে এমন দুর্ঘটনা হল তার জন্যে আমি মহাখুশী। কারণ তাতে করে আমি রামজীর কৃপায় তাকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছি।

DO NOT COPY

একবার বারানসী ধাম থেকে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এলেন রামদাসজীর সঙ্গে তর্ক করতে। তিনি রামদাসজীর সাধন মাহাত্ম শুনেছেন। তাঁর লেখা বইও পড়েছেন, এবার প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হতে ইচ্ছে করলেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী পণ্ডিত। তাঁর গলার পৈতার সঙ্গে একটা ছুরি বাঁধা থাকতো। সেটি দেখিয়ে তিনি সকলকে বলতেন যে আমাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন আমি তখুনি নিজের হাতে এই ছুরি দিয়ে তাঁর সামনে আমার জিভ কেটে ফেলবো।

এমন জেদী পণ্ডিত এলেন রামদাসজীর সঙ্গে তর্ক করতে।

রামদাসজী শিষ্যদের মুখে ঐ পণ্ডিতবরের কথা শুনে তাঁকে সাদরে আহ্বান জানালেন।

কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামদাসজীর সাদর আহ্বান প্রীতির চোখে দেখলেন না। দর্প ভরে বলতে লাগলেন, আমার সময়ের অনেক দাম আছে। আর দেরী না করে আপনি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

রামদাসজী পণ্ডিতের এমন ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। পরে বললেন, বিদ্যা মানেই সেই পরম ধন যা হৃদকন্দর আলোকিত করে। তবে শাস্ত্র জেনেও আপনি এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন বলুন তো?

রামদাসের কথা শুনে গর্জে উঠলেন পণ্ডিতপ্রবর। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, বটে, এতো তোমার ঔদ্ধত্য! এখানে কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো তা জানো?

রামদাসজী সবিনয়ে বললেন, হে পণ্ডিতপ্রবর! আমার খুব ভালভাবে জানা আছে। এবার একটু অনুগ্রহ করে আপনি আপনার শাস্ত্রতত্ত্বের প্রশ্ন তুলুন। এখনি সব উত্তর ঠিক মত পাবেন।

রামদাসের কথা শুনে মহা উত্তেজিত হলেন পণ্ডিতপ্রবর।

কিন্তু রামদাসজী রইলেন নির্বিকার। তিনি তলে তলে তাঁর বিভূতির লীলা করে চলেছেন। সামনে অগণিত জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন অর্দ্ধশিক্ষিত লোককে কাছে ডেকে নিলেন।

সেই লোকটি তাঁর কাছে আসতেই তিনি তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন। সেই সঙ্গে তাকে শিখিয়ে দিলেন, বৎস, পণ্ডিতজীর সব কটা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তুমি দাও দেখি।

এরপর ঘটতে থাকে অঘটন। ঐ অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অনর্গল শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

তাই শুনে বারাণসীর পণ্ডিত তো বিস্ময়ে হতবাক।

এর মধ্যে তিনি জেনে নিয়েছেন যে রামদাসজী হচ্ছেন এক সিদ্ধ সাধক। তাঁর কাছে অযথা দম্ভ প্রকাশ করা মহা অন্যায়।

এবার রামদাসজীর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখে দাম্ভিক পণ্ডিত তাঁর চরণে নিপতিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং নিজের জিভ কাটার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেন।

রামদাসজী পণ্ডিতকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তারপর তাঁর পৈতায় বাঁধা ছুরিটি খুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

পরে ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, পণ্ডিতজী, আমি আপনাকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছি। মনে রাখবেন, আপনার জিভ, আপনার দেহ, সবই হচ্ছে রামজীর। একে কাটতে হয় তিনি কাটবেন। আপনার দেহ-মন আত্মা কোন কিছুর ওপরই তো আপনার অধিকার নেই। ভালই হলো, অহংকার এবার নষ্ট হয়ে গেল। এবার সত্যিকার বিদ্যা আপনি গ্রহণ করতে পেরেছেন।

পরে ঐ পণ্ডিত রামদাসজীর প্রিয় শিষ্য হন এবং বারাণসীতে ফিরে যাবার সময় রামদাসজীর লেখা গ্রন্থ ‘দাসবোধ’ সঙ্গে নিয়ে যান।

DO NOT COPY

মাতৃ-প্রণাম

শ্রী প্রকাশ অধিকারী

আমি যে ভাষায় কথা বলি
সেটি আমার নয় ---
আমার মায়ের।

তুমি যে ভাষায় কথা বলো
সেটিও তোমার নয় ---
তোমার মায়ের।

মাকে বাদ দিলে
কী থাকে জীবনে?
শয়নে স্বপনে ...

মা, মাতৃভাষা, মাতৃভুমি
সমার্থক জেনে
এসো গড় হই, মাকে প্রণাম করি।

হৃদয় মাঝে অস্ত্র ধরি

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

একটু কৃপার তরে মনের সাথে যুদ্ধ করি
সাধনায় জয়ের তরে হৃদয় মাঝে অস্ত্র ধরি।
ধন্য হবে বিশ্বভুবন ভজিলে গুরুর চরণ
চপল মন করিতে নিধন
হৃদয় মাঝে অস্ত্র ধরি।
বিশ্বজয়ের সাধনা গুরুর কাছে প্রার্থনা
মোদের আর থাকবে না ষড়রিপুর যাতনা।
মুক্তির তরে মোরা গুরুর কৃপা সদা স্মরি
পাপ তাপ করিতে পতন
হৃদয় মাঝে অস্ত্র ধরি।

পুনর্মিলন

সুনন্দন ঘোষ

অনেক বছর আগে
স্বর্গ থেকে একরাশ পারিজাতের কুঁড়ি জড়ো হয়েছিল মর্ত্যের থালায়।
কুঁড়িগুলো ফুটছে যখন একটু একটু করে
বিধাতা-পুরুষ তাদের ছড়িয়ে দিলেন
ধরিত্রীর কোলে।
কেউ মুখ লুকোল দমকা হাওয়ায়,
কেউ পৌঁছল প্রাসাদে, কেউ দেবালয়ে।

সময়ের ব্যবধানে কুঁড়ি আজ ফুল।
সুগন্ধের আবেশে তারা দূরে থেকেও বাঁধা ছিল
অদৃশ্য মায়ায়, পুনর্মিলনের আকুতি নিয়ে।
সার্থক আজ তাদের আস্পৃহা।

দিনশেষে অনন্ত-জীবনে ফিরে যাবার আগে
বিতত ফুলের রাশি গ্রথিত হচ্ছে বিনেসূতোর মালায়।

DO NOT COPY